ছোটদের লেনিন

নিকোলাই বগদানভ

ছোটদের লেনিন

ছবি এ'কেছেন: ই. ল. উশাকভ

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

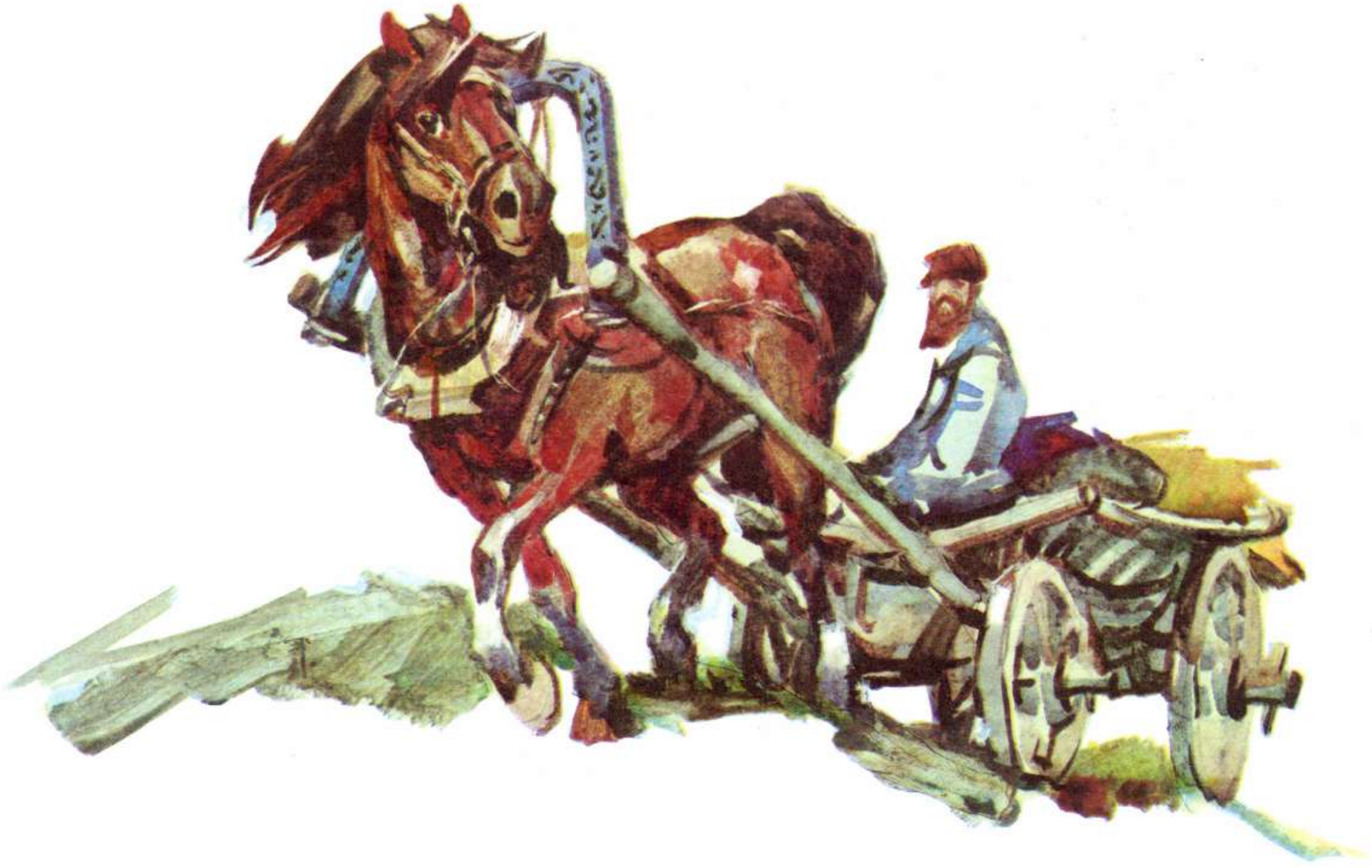

সবচেয়ে প্রধান

সব ছেলেমেয়ের মত ভলোদিয়া উলিয়ানভও প্রায়ই ভাবত: কে সবচেয়ে বড়? কে সবচেয়ে শক্তিশালী? দুনিয়ায় কে সবচেয়ে প্রধান?

নিজেই সে সবকিছু জানতে ভালবাসত। প্রথমে জানল, সবচেয়ে শক্তিশালী — ঘোড়া। তাকে গাড়িতে একবার জুতলেই হল, অমনি সে একসঙ্গে মা বাবা ভাই বোন ও তাকে নিয়ে দেবে দৌড়। আর প্রধান হল সহিস। যেই সে বলবে 'হেই, চল্' অমনি ঘোড়া চলবে টগ্‌বগিয়ে।

তারপর একদিন ভলোদিয়া গেল সার্কাসে। ওখানে সে জানল, সবচেয়ে বড় হল হাতি। এত বিরাট, যেন পাহাড় আর কি। পিঠে তার ছোট্ট একখানা ঘর, তাতে সেজেগুজে বসে আছে বানরেরা। আর তার চেয়ে প্রধান হল সঙ। কিন্তু হাতি তার ভয়ংকর শুঁড় দিয়ে কলার ধরে সঙকে হ্যাঁচকা টানে নিয়ে চলে গেল। সবাই ওঠে হেসে, ভলোদিয়াও হাসে তাদের সঙ্গে। না, তাহলে সঙ সবচেয়ে প্রধান নয়।

শিগগিরই ভলোদিয়া জানল, দুনিয়ায় হাতির চেয়েও বড় কিছু আছে — তা হল স্টিমার। স্টিমার ডাঙায় চলে না, চলে নদীতে। হাঁসের চেয়েও জোরে তা জলে ডানা ঝাপটায়, আর কী ভীষণ তার হাফ্‌হাফ্ শব্দ — হাতির ডাকের চেয়েও জোরালো!

একবার একখানা স্টিমার ঘাটে ভিড়তে গিয়ে এমন প্রচণ্ড আওয়াজ করল যে ঘোড়ারা সব গেল ভড়কে। কিন্তু ভলোদিয়া মোটেই ডরায় নি, তার সঙ্গে ছিল বড় ভাই সাশা, তার কিছুতেই ভয় নেই।

স্টিমারে একনাগাড়ে লোক উঠছে তো উঠছেই। লোকের যেন শেষ নেই। আর এদিকে স্টিমারের তর সইছিল না। সে এমন ভোঁ দিল যে লোকের কানে তালা লাগার মত অবস্থা। তারপর ছিটকে সরে এল স্টিমার। আর একটু হলেই গোটা শহরটাকে নিয়ে ছুটত। স্টিমারখানা বাঁধা ছিল মোটা একটা খুঁটির সঙ্গে, দড়িটা খুলতে কারো মনে ছিল না। ফলে পুরো জেটিটাই টলে উঠল। লোকেরা গেল ঘাবড়ে, শুরু হল চেঁচামেচি। মাল্লারা দড়ির বাঁধন খুলে দিল, স্টিমারও নিজের পথ ধরল, আর শহরটি পড়ে রইল পেছনে।

যাত্রীরা এই ভেবে খুশি যে সবকিছুই ভালোয় ভালোয় উতরে গেছে। তারা রুমাল নেড়ে বিদায় জানাল। অনেকে হাসল, আবার অনেকে কাঁদলও বৈকি।

স্টিমারখানা ছিল বড়, তাতে প্রচুর ছোট ছোট কামরা, সেগুলোতে বসে জ্যাম-বিস্কুট দিয়ে দিব্যি চা খাওয়া চলে।

মা সবাইকে চা ঢেলে দিচ্ছেন। বাবা পড়ছেন খবর-কাগজ। বড় বোন আনিয়ার নজর ভলোদিয়ার ওপর, সে যেন দুষ্টুমি না করে। ভলোদিয়ার কিন্তু ভীষণ একঘেয়ে লাগছে। রুপোর চামচেখানা বাবার চায়ের কাপে একটু একটু টুংটাং শব্দ করছে। মেঝে কাঁপছে।

সবাই যখন চা খেতে বসল, ভলোদিয়া তখন সোফা থেকে নেমে শুনতে লাগল স্টিমার কীভাবে শ্বাস নিচ্ছে। ভেতরে তার কীরকম ধুকধুক শব্দ, অনেকটা মানুষেরই ভেতরকার ধুকধুকানির মত। ফুটো করে একটু দেখতে মন চাইল ভলোদিয়ার। কিন্তু আগে একবার সে তার খেলনা ঘোড়াটি ফুটো করে দেখেছিল যে তার ভেতরে আছে শুধু ন্যাকড়া আর খড়কুটো। ভলোদিয়া তো ভাবনায় পড়ল: স্টিমারের ভেতরে কী যে ধুকধুক করছে তা কীভাবে জানা যায়?

— কী ভাবছিস তুই ভলোদিয়া? — জিজ্ঞেস করে সাশা।

আর ভলোদিয়া ওর বুকে কান পেতে শোনে: ধুকধুক-ধুকধুক।

— ওটা হৃৎপিন্ড, — বলে সাশা। সে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেলে ভলোদিয়া কী ভাবছে, — আর স্টিমারের ভেতরে মেশিন।

মেশিন! এবার তা দেখার জন্যে ভলোদিয়া পাগল!

কয়েকবার সে বেরিয়ে ডেক-এ চলে যায়, তবে প্রতিবারই আনিয়া তাকে ধরে আনে, বলে: "ঢের হয়েছে, এবার দুষ্টুমি রাখ্ তো!'

একবার তো ভলোদিয়া দৌড়ে একেবারে লোহার দরজাটা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ওখানে বেশ গরম। শব্দও ভীষণ। যেই সে লোহার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে যাবে, কাপ্তেন তাকে বললেন:

— এই খোকা, মেশিন ঘরে যেও না!

— আমি অল্প একটু দেখব?

— না না, লেখা দেখতে পাচ্ছ না: 'প্রবেশ নিষেধ'? আমিই ওখানে যাই না। — কাপ্তেন পেছনে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন: — কার ছেলে এ?

দিদি তাকে ধরে ফেলল, তারপর মার কাছে নালিশ করল। এবার ভলোদিয়াকে অনেকখন সোফায় বসে থাকতে হল।

গভীর রাত। সবাই ঘুমোচ্ছে। কিন্তু ভলোদিয়া ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল। ঘুমকে ঠকিয়ে আবার সে চুপিচুপি ডেকে গেল।

এবার তাকে কেউ বাধা দিল না। এমনকি ডেকের যাত্রীরাও বাক্স, সুটকেশ আর পোঁটলাপুঁটলিতে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। আর স্টিমার চলছে তো চলছেই। নদীর দু'পাড়ে আছড়ে পড়ছে অসংখ্য ঢেউ। রাতের নীরবতায় শোনা যায়, স্টিমারের ভেতরে অনেক গভীরে কীসের বিকট শব্দ। ওটা মেশিনের। এত গভীরে ঠেসাঠেসিতে তা যেন হাঁফিয়ে উঠেছে। সময় সময় তা এমন মোচড় খাচ্ছে যে সারা স্টিমারটাই উঠছে শিউরে। আর স্টিমারের সামনের ঘণ্টাটা আপনা থেকেই বেজে যাচ্ছে।

উপরের ডেক থেকে ভলোদিয়া নামল নিচের ডেকে। গেল স্টিমারের একেবারে মাঝখানে। ওখান থেকেই শুরু হয়েছে বিরাট কালো এক চিমনি। গরম লাগে ভলোদিয়ার।

ওখানে সমস্ত কিছুই গরম, এমনকি হাতে ধরার রেলিঙও। হঠাৎ ভলোদিয়া আলো দেখতে পায়। আলোটি আসছে নিচের আধ-খোলা ঝাঁজরি থেকে।

পা টিপে টিপে গিয়ে ভলোদিয়া তাকায় নিচের দিকে। গায়ে এসে লাগে তার দমকা গরম হাওয়া, ফুরফুর করে ওড়ে চুল। মেশিনের শ্বাস ফেলার ধরনটা বড়ই ভয়ংকর। ভয়কে জয় করে ভলোদিয়া তাকায় মেশিনটার দিকে। ওটা রয়েছে অনেক গভীরে, যেন একেবারে কুয়োর মধ্যে। দেখতে প্রায় হাতিরই মত বিরাট, ধূসর। তবে একটু বড় এই যা। তার ইস্পাতের প্রকান্ড দাঁড়াগুলি সশব্দে একবার চলছে এদিকে, একবার ওদিকে — ফিংশ-ফুংশ ফিংশ-ফুংশ!

তার মানে এখানেই স্টিমারের প্রধান শক্তি।

প্রথমে ভলোদিয়া বুঝতে পারে নি: মেশিনটা কীকরে স্টিমারখানাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? হঠাৎ নিচে দৃষ্টি ফেলতেই দেখে একটি লোককে। গায়ে তার তেল-মাখা কামিজ, মাথায় টুপি। লোকটির এক হাতে একটা লম্বা নাকওয়ালা কেটলি, আর অন্য হাতে — তেল চটচটে ন্যাকড়া।

দিলখোলা প্রভুর মত লোকটি মেশিনকে খাওয়াচ্ছে। খাওয়ানো হয়ে গেলে নরম ন্যাকড়া দিয়ে আলগোছে মুছে ফেলছে পড়ে-থাকা তেলের ফোঁটাগুলি। লোহার দরজায় ঠেস দিয়ে ভলোদিয়া একটু ভাল করে দেখতে চাইল। কিন্তু দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। লোকটি মাথা তুলল। সারা মুখে ঘাম। তার গরম লাগছিল।

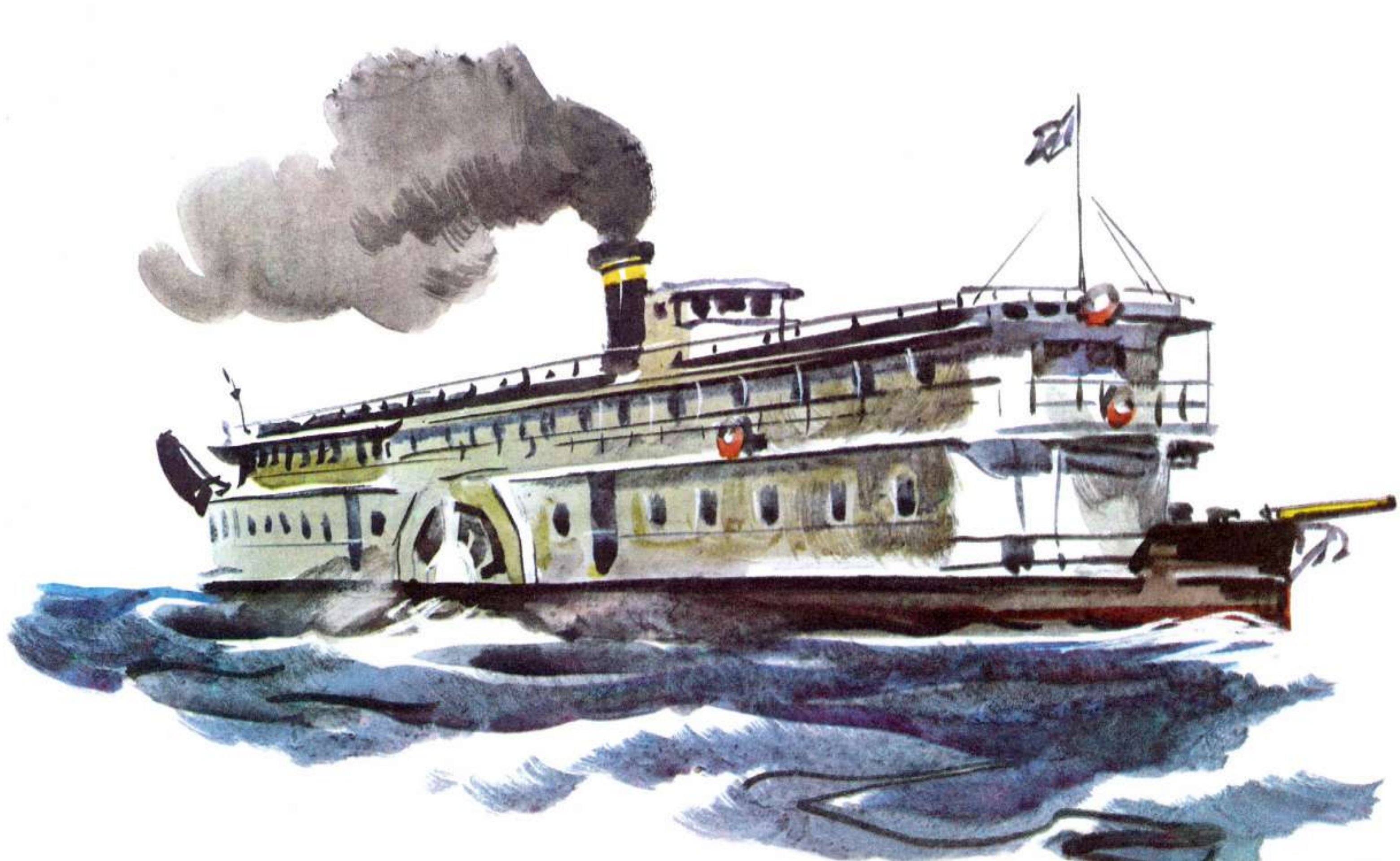

এত রাত্রে একটি ছেলেকে এত কাছে দেখে লোকটি কিন্তু মোটেই রাগ করে নি। বরং মাথা নেড়ে একটু মিষ্টি হাসল।

লোকটি মেশিনে হাত বুলায়, যেন দেখাতে চায় যে মেশিন তার কথা শুনছে, তারপর কী যেন বলে মেশিনকে।

কিন্তু ভলোদিয়া মেশিনের শব্দে কিছুই শুনতে পায় না। সে জিজ্ঞেস করে:

— তুমি কে?

— ইনি শ্রমিক, ইঞ্জিন দেখাশোনা করেন, — হঠাৎ শোনা যায় সাশার গলা। ভলোদিয়া টেরই পায় নি যে সাশা সবসময় তার পেছন পেছন এসেছে, সে জানতে চায় ভলোদিয়াকে কী এত টানছে, কী খুঁজছে সে।

— সাশা, দেখ্ লোকটি কেমন! — হাসিখুশি সাহসী লোকটিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠে ভলোদিয়া। — পেয়েছি!

— সবচেয়ে প্রধানকে পেয়েছিস? চমৎকার! শান্ত হলি তো? তাহলে চল্ এবার! — ছোট ভাইয়ের হাত ধরে সাশা তাকে নিয়ে যায়।

ভলোদিয়া বাধা দেয় না। সে খুশি। যা তার জানার ইচ্ছা ছিল তা সে জেনে ফেলেছে। নিজেই জেনেছে।

পথের নিশানা

একদিন ভলোদিয়া আর তার বড় ভাই সাশা কোন এক পথচারীর প্রায় অস্পষ্ট পায়ের দাগ দেখতে দেখতে যাচ্ছিল বনের মধ্যে দিয়ে। মাড়ানো ঘাস আবার খাড়া হয়ে উঠেছে, লোকটির পায়ের দাগ অনেক আগেই লতা-পাতায় গেছে ঢেকে। কখনও-কখনও পথটি ঠিক করতে হচ্ছিল শুধু আন্দাজের ওপর — লোকটির রেখে-যাওয়া বিভিন্ন চিহ্ন দেখে। এই তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝরনাটির ওপরে ঝুলিয়ে রেখে গেছে সে বার্চের বাকলায় তৈরি একটি বাটি। লোকে তাতে করে নির্মল জল খেতে পারবে। এই তো কাদাভরা নালাটার ওপর ফেলে রেখেছে সে দু'টো খুঁটি — কেউ যাতে জলে-কাদায় ভিজে না যায়। এই তো পথের ধারে সরিয়ে রেখে গেছে ঝড়ে-ভাঙা বিরাট এক লটকে-থাকা ডাল — তা কারো ঘাড়ে পড়লে বিপদ হতে পারত তো।

সাশা যাচ্ছে আর ভুরু কোঁচকাচ্ছে। সে পথ ধরল কোনাকুনি, যাতে তাড়াতাড়ি পেঁছতে পারে বনরক্ষকের কুটিরে: ওখানেই উঠেছেন উলিয়ানভদের পুরো পরিবার, তাঁরা এসেছেন ব্যাঙের ছাতা তুলতে। কিন্তু সাশা পথ হারিয়ে ফেলল।

সে ভাবল, 'শেষ পর্যন্ত অবশ্য পথ খুঁজে পাবই, তবে ভলোদিয়ার খুব কষ্ট হবে, — ও যে ছোট।' চিন্তিত মুখে তাকাল সে ছোট ভাইটির দিকে।

ভলোদিয়া একটু ক্লান্ত আর ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হাসছে। তার হাসি দেখে সাশা অবাক হয়।

— এত ফুর্তি কিসের রে? — জিজ্ঞেস করে সাশা। — হাসছিস কেন?

— তুই কিছু দেখছিস না? — চালাক চোখ কুঁচকে বলল ভলোদিয়া। — জানিস, আমাদের আগে এখান দিয়ে গেছে খুব ভালো একটি লোক। যেতে যেতে পথে সে কত ভালো কাজ করে গেছে।

সাশা বিস্মিত: ছোট্ট ছেলের মাথায় কোত্থেকে এল এ-ধরনের চিন্তাভাবনা? কী বলবে ভেবে পায় না সে, — আমরা কখনই আমাদের ছোট ভাইদের কথায় দাম দিই না।

সাশা কিন্তু জড়িয়ে ধরল ভলোদিয়াকে, আর তারপর একটু ভেবে বলল:

— ব্যাপারটা তাই, ভলোদিয়া, জীবনেও মানুষকে এমনি করে মহৎ কাজের নিশানা রেখে যেতে হয়।

দাদার এই কথাগুলি ভারি মনে ধরে গেল ভলোদিয়ার।

উপহার

লেনিনের স্ত্রী ও বন্ধু নাদেজ্‌দা কনস্তান্তিনোভনা ক্রুপ্‌স্কায়া পাইওনিয়রদের কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

'ভিয়াৎকার পাইওনিয়ররা ১৯২২ সালে গুরুতর অসুস্থ ভ্লাদিমির ইলিচকে পাঠায় তাদের প্রথম পাইওনিয়র উপহার — ছবি, ফুল ও নিজের হাতে-তৈরি অন্যান্য জিনিস।

'আমি উপহারগুলি রাখি উপরতলার বড় ঘরে। লেনিন পাশ দিয়ে যান, ওগুলো দেখেন, মুখে তাঁর হাসি।'

লেনিন যে-বাড়িতে থাকতেন তা এখন মিউজিয়ম। পাইওনিয়রদের সঙ্গে আমরা একবার গেলাম সেখানে। পাইওনিয়ররা দেখল উপহারগুলি, কয়েকজন তো হেসেই ফেলল: উপহারগুলি একেবারেই সাদামাঠা। কাপড়ে-বাঁধানো একখানা অ্যালবাম দেখিয়ে একটি ছেলে বলল:

— এখন বুঝতে পারছি, লেনিন কেন হেসেছিলেন। এমন উপহার দেখে কার না হাসি পায়!

কিন্তু তা একদমই ঠিক নয়। নাদেজ্‌দা কনস্তান্তিনোভনা বললেন, উপহারগুলো দেখে লেনিনের আনন্দ হত। যদিও ওগুলো খুব একটা উতরোয় নি, তবুও খোদ শিশুরাই তো বানিয়েছে — এই ভেবে লেনিন মনে মনে খুশি হতেন।

দোকানে তো আর সুন্দর সুন্দর উপহারের অভাব নেই। কিন্তু ছেলেমেয়েদের নিজের হাতে-গড়া এমন উপহার কেউ পয়সা-কড়ি দিয়েও কিনতে পায় না। তাতে আছে প্রকৃত ভালোবাসা।

সাদাসিধে এই জিনিসগুলি লেনিনকে যেন বলত, জার-আমলের নির্বাসন এলাকা সুদূর ভিয়াৎকায়ও আছে লাল টাই-পরা ছেলেমেয়েরা, ওরা তাঁকে ভালবাসে, তাঁর কথা ভাবে আর তাঁর আদর্শকে মানে।

ভিয়াৎকার পাইওনিয়রদের চিঠিখানাও লেনিনকে বিশেষ আনন্দ দেয়। ওখানা তারা পাঠায় উপহারের সঙ্গেই।

লেনিন বিশ্বাস করতেন যে বড় হলে এই ছেলেমেয়েরাই হবে আসল কমিউনিস্ট।

প্রিয় ইলিচ দাদু,

আমরা — শ্রমিকের
ছেলেমেয়ে। থাকি আমাদের প্রিয়
তোমারই নামাঙ্কিত শিশুভবনে।
আমরা সযত্নে পালন করছি
তোমার উপদেশ। মেহনতী
মানুষের সুখের জন্যে, সব শ্রমিক
ছেলেমেয়ের সুখের জন্যে তোমার
সংগ্রামে আমরাও আছি।
কমিউনিজম নির্মাণের উদ্দেশ্যে
তোমার আরব্ধ কাজ আমরাই
চালিয়ে যাব...

ছবি আঁকা চিঠি

বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও শ্রমিক-কৃষকের কাছে লেখা লেনিনের প্রায় সমস্ত চিঠিপত্রই সংগ্রহ করা হয়েছে। ওগুলো আছে মস্কোর কেন্দ্রস্থলে একটি বড় বাড়িতে — বিশেষ ইনস্টিটিউটে। লেনিনের এইসব চিঠিপত্র আজ রাষ্ট্রের সম্পদ।

বিজ্ঞানীরা চিঠিগুলি নিয়ে গবেষণা করেছেন। এখন আমরা জানি: কাকে, কোথায়, কখন ও কী ব্যাপারে লেনিন প্রতিটি কথা লিখেছিলেন।

কিন্তু এগুলির মধ্যে আছে একেবারে অসাধারণ একখানা চিঠি। তা দেখতে অনেকটা বার্চের শাদা বাকলায় কালি দিয়ে-আঁকা সুন্দর ছবির মত। অক্ষরের বদলে তাতে রয়েছে মানুষ পশুপাখি গাছপালা ইত্যাদির ছবি।

এই চিঠিখানা এঁকেছিল ভলোদিয়া উলিয়ানভ। তখন তার বয়স বারো বছর। চিঠিখানা সে পাঠায় তার স্কুলের বন্ধু বরিস ফার্মাকোভস্কিকে — যখন বরিস মা-বাবার সঙ্গে সিম্বির্স্ক (এখন উলিয়ানভস্ক) ছেড়ে চলে যায় ওরেনবুর্গে।

ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে দুই বন্ধু সম্ভবত ঠিক করেছিল যে তারাও রেড ইন্ডিয়ানদের মত 'টোটেম'-এর ছবি এঁকে চিঠি লেখালেখি করবে — এতে ভীষণ মজা হবে, তাছাড়া সব ছেলেমেয়েদেরই মত তাদেরও নিজস্ব গোপন ব্যাপার-স্যাপার ছিল নিশ্চয়ই।

অসাধারণ এই চিঠিখানা পাওয়া গেছে উলিয়ানভ ও ফার্মাকোভস্কি পরিবারের লেখা পুরনো চিঠিপত্রের মধ্যে। চিঠিখানা পাঠাতে গিয়ে লেনিনের বাবা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভ লিখেছিলেন: 'ভলোদিয়া বরিসের প্রতিশ্রুত চিঠির অপেক্ষায়।' কেমন, এবার তোমরা বুঝতে পারলে তো সবকিছু?

চিঠিখানা বহুকাল কেউ-ই পড়তে পারে নি। শেষে তাতে মন দিলেন ডক্টর ভ. ইস্ত্রিন। ছবির সাহায্যে লেখা রেড ইন্ডিয়ানদের পুরনো যে-সমস্ত চিঠির অর্থোদ্ধার ইতিমধ্যে সম্ভব হয়েছে ইস্ত্রিন সেগুলোর সঙ্গে ভলোদিয়ার চিঠিখানা মিলিয়ে দেখেন। এইভাবেই তিনি চিঠিখানা পড়তে সক্ষম হন। ইস্ত্রিন মনে করেন যে চিঠিতে আঁকা সামোভার, সারস, নদী, ব্যাঙ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ভলোদিয়া খুব সম্ভব নিজেকে ও রেড ইন্ডিয়ান-রেড ইন্ডিয়ান খেলায় তার সাথীদেরই বোঝাতে চেয়েছে। আর এই সবকিছু থেকে যে টানগুলি চলে গেছে পুকুরে কালো-দাড়িওয়ালা লোকটির দিকে ওগুলোর মানে হল — ছ'জনের সবাই তার কাছে কোনকিছু চাইছে। ছেলেমেয়েরা কী-ই বা চাইছে লোকটির কাছে?

শিকার-শিকার খেলার পর ছেলেমেয়েদের খিদে পাওয়ায় (ওই ছবিতে: অস্ত্র হাতে ছ'টি ক্ষুদে লোক, ভালুক, আকাশে পাখি, আর পাশেই সসেজের টুকরোগুলোর ওপর ঝুঁকে রয়েছে হাঁ-করা ছ'টি মুখ, ঘড়া আর খাবারের প্লেট) তারা যেন লোকটিকে বলছে: 'এই, দেখছ না আমাদের খিদে পেয়েছে! ঢের স্নান হয়েছে, এবার শিগগির বাড়ি এসে আমাদের খেতে দাও।' তবে যদি সে তাদের খেতে না দেয়, তাহলে কী হবে? এর জবাব দিচ্ছে ডান দিকে উপরের কোণের ছবিটি: খেতে না দিলে আমরা মরে যাব!

আমাদের মনে হয়, 'টোটেম'-এর ছবিতে-আঁকা ভলোদিয়ার চিঠিখানার এ রকম অর্থোদ্ধার চমৎকারই হয়েছে।

সূচি

সবচেয়ে প্রধান ২
পথের নিশানা ৮
উপহার ১০
ছবি আঁকা চিঠি ১৫

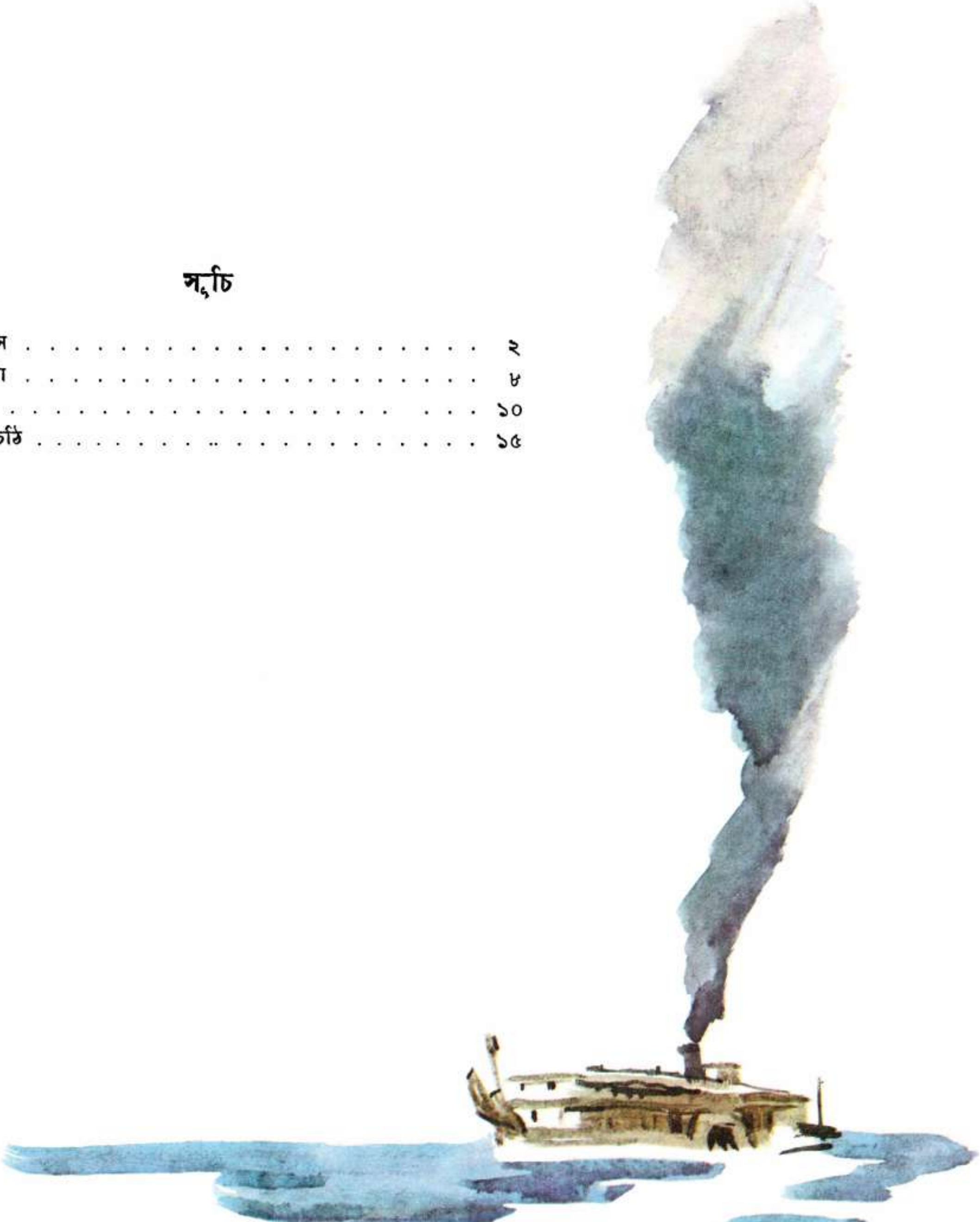

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: বিজয় পাল

Н. Богданов

УЛЫБКА ИЛЬИЧА

на языке бенгали

Перевод сделан по книгам
Н. Богданова: «Улыбка Ильича»
и «След человека».
Издательство «Малыш». 1974 г.

© বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৭৮
সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত